৫

ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার

আবদুল্লাহ আল ফারুক

এই অধ্যায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন এবং আদালতের সিদ্ধান্তগুলো আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে জরুরি বিধিমালার অধীনে জামিন লাভের অধিকাররের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই অধিকারকে যেভাবে সংকীর্ণ করা হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে এখানে। জামিন প্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে এমন সব সংস্থার দ্বারা জরুরি অবস্থায় মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের সাক্ষী হয়ে আছে ২০০৮ সাল। জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার মাধ্যমে সভা-সমাবেশ, মিছিল (ধর্মীয় ও সামাজিক ছাড়া), বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধ আরোপকারী জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ এবং জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার অনেক বিধান একদিকে যেমন সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদের সরাসরি পরিপন্থী, অন্যদিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনেরও বিরোধী। এসব বিধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– গ্রেফতার এবং আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহৃত কিছু সুনির্দিষ্ট আইনি বিধানের কাটছাঁট এবং নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান। জরুরি বিধিমালার ১৬(২) বিধিতে বলা হয়েছে, আইন-বহির্ভূত কোনো কাজ করছে বা করতে যাচ্ছে, শুধু এরূপ সন্দেহের ভিত্তিতে

কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে এবং এক্ষেত্রে সে জামিনের আবেদনও করতে পারবে না। বিধি ১৯ঘ জামিনের আবেদন করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা অর্পণের পাশাপাশি জামিন আবেদন শুনানি করার ক্ষেত্রে আদালতের (সুপ্রিম কোর্টসহ) সহজাত এখতিয়ারকেও খর্ব করা হয়েছে। বিধি ৩ থেকে ৮ জরুরি বিধিমালার অধীনে বিচারাধীন বিভিন্ন অপরাধের দ্রুত বিচারের জন্য বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে।

সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮

এই অধ্যাদেশে সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসে আর্থিক সহায়তাদানসহ কতগুলো নতুন অপরাধকে বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অধ্যাদেশটি মানবাধিকার সংগঠন ও আইনজীবীদের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। কেননা এটি একদিকে যেমন রাজনৈতিক ভিন্নমত ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারকে চাপে রাখার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনী কর্তৃক অপব্যবহারের সুযোগও তাতে রয়েছে।[১] এই অধ্যাদেশে 'সন্ত্রাস'কে বিস্তৃতরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, 'যে কোনো কাজ যা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, একাত্মতা, অখণ্ডতা অথবা নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ অথবা যা সাধারণ জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে অথবা সরকারি কাজকে বাধার সৃষ্টি করে' তা সন্ত্রাস হিসেবে অভিহিত হবে।[২] হত্যা, মারাত্মক জখম, আটক, অপহরণ, অন্যের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ইত্যাদিসহ বিস্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ, আগ্নেয়াস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য নিজের কাছে রাখাকেও সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[৩] সন্ত্রাসী কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা দানও এই অধ্যাদেশে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। যে ব্যক্তি বা যারা সন্ত্রাসকে আর্থিক মদদ দেবে সে বা তারা জরিমানাসহ সর্বনিম্ন তিন বছর ও সর্বোচ্চ বিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৪] সন্ত্রাসীকে আশ্রয়দানও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[৫] যে এসব কাজে তথ্য সরবরাহ করবে অথবা অন্য কোনোভাবে সমর্থন যোগাবে সে ব্যক্তিও জরিমানাসহ সর্বনিম্ন দুই বছর এবং সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। জনমনে আতঙ্ক তৈরি করে এমন হত্যাকাণ্ড এবং দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ সন্ত্রাসী কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী বা এরূপ কাজের পরিকল্পনাকারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৬]

---

১ দেখুন : *আইন ও পলিসিগত উন্নয়ন* বিষয়ক অধ্যায় ২।
২ সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮, ধারা ২।
৩ *প্রাগুক্ত*, ধারা ৬।
৪ *প্রাগুক্ত*, ধারা ৭।
৫ *প্রাগুক্ত*, ধারা ১৪।
৬ *প্রাগুক্ত*, ধারা ১২।

জামিন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে প্রসারিত করে, ফলস্বরূপ বাঘা বাঘা রাজনৈতিক নেতাসহ অনেককে গ্রেফতার বা আটক করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক আইনি পদ্ধতি অনুসরণ না করার ব্যাপক অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা গেছে।[৭]

জামিন সংক্রান্ত বিধানগুলোকে আরও কঠোর করার জন্য জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় বেশ কয়েকবার সংশোধন আনা হয়। ২০০৭ সালের ২১ মার্চ সরকার জরুরি বিধিমালাকে সংশোধন করে জামিনের আবেদন করার অধিকার, নিম্ন আদালতে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ মামলায় উচ্চ আদালত থেকে প্রতিকার পাওয়া প্রভৃতি বিধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যা আইনজীবী, মামলার পক্ষ এবং মানবাধিকার কর্মীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়।[৮] দুর্নীতি, চোরাচালানি, কালোবাজারি, মজুদদারি, নকল টাকা প্রস্তুত, অবৈধভাবে অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, বৈদেশিক মুদ্রা, মাদকদ্রব্য প্রভৃতি দখলে রাখা, কর ফাঁকি এবং অন্য যে কোনো অপরাধ যা রাষ্ট্র, জনগণ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ ইত্যাদি অপরাধগুলো জরুরি বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন আপিল বিভাগ ২৪ এপ্রিল রায় দেয় যে, জরুরি বিধিমালার অধীনে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি জামিনের যোগ্য হবে না। রায়ে বলা হয়, জরুরি বিধিমালার অধীনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে কোনো আদালত এমনকি হাইকোর্টেরও জামিন দেয়ার এখতিয়ার নেই। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো জরুরি বিধিমালার ১৬(২) বিধির অধীনে যদি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মামলাটি করা হয় অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কেউ মামলাটি করে তাহলে জামিন আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে। অনেক বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানকে জনগণ সমর্থন করেছিল। কিন্তু জরুরি বিধিমালার অধীনে জামিন না পাওয়া, বাছাই করে এধরনের মামলা করা, রাঘববোয়াল দুর্নীতিবাজদের মামলা ধীরগতিতে বিচার হওয়া ইত্যাদি কারণে এই

---

৭ উদাহরণস্বরূপ– ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম জামিনে মুক্তি পেয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বাইরে আসার পরমুহূর্তেই পুলিশ তাকে অন্য একটি মামলায় আবার গ্রেফতার করে। দেখুন: 'মির্জা আজম হেল্ড আফটার রিলিজ', *দি ডেইলি স্টার*, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৮ 'ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারা অথবা অন্য কোনো আইনে যাই বলা থাক না কেন, জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশের অধীনে মামলা অনুসন্ধান, তদন্ত এবং বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পাবে না', বিধি ১৯ঘ, জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা।

অভিযানের ব্যাপক সমালোচনাও হয়।[৯]

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক দায়ের করা ২০০টির বেশি মামলা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে বেশিরভাগ মামলারই পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে। বড় বড় দুর্নীতির কারণে যেসব দুর্নীতিবাজ বা তাদের সহযোগীদের গ্রেফতার করা হয় তারা শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট থেকে জামিন পায়। দুর্নীতির মামলায় এভাবে জামিনলাভ এবং হাইকোর্টে দুর্নীতির মামলা স্থগিত হওয়া দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের দুর্বলতাই তুলে ধরে এবং আংশিকভাবে তা সরকারের রাজনৈতিক কৌশলকেও নির্দেশ করে। কারণ ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন করার জন্য অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে সরকার চাপে ছিল যা আবশ্যিকভাবেই আইনি পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মতে, হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত অনেক ব্যক্তিকে নজিরবিহীনভাবে জামিন প্রদান করেছেন। ১৪ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট ২০০৮ সময়ের মধ্যে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ৭৬ জনকে জামিন দেন। প্রতি ৬৩ সেকেন্ডে একটি করে মামলার আদেশ দিয়ে ঐ একই বেঞ্চ ২৮ আগস্ট একদিনে মোট ২৯৮টি মামলার আদেশ দেন। ২৫ আগস্ট ঐ বেঞ্চ ২০২টি, ২৬ আগস্ট ১২৯টি এবং ২৭ আগস্ট ১২৬টি মামলায় আদেশ দেন। অর্থাৎ চারদিনে (২৫ থেকে ২৮ আগস্ট) এই বেঞ্চ মোট ৫৯৩টি মামলার আদেশ দিয়েছিলেন, যার মধ্যে অধিকাংশ মামলাই দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।[১০]

বিধি অনুসারে ৩০ দিনের মধ্যে সন্দেহভাজনদের সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতা এবং দুর্নীতির মামলা দায়েরের ৬০ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতা, তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করতে ব্যর্থতা অথবা মূল অপরাধীর স্ত্রী ও সন্তানসহ দুর্নীতিতে সহায়তা দানকারী বা উৎসাহ দানকারীদের প্রতি সম্পদের হিসাব দাখিলের নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতা ইত্যাদি ছিল দুর্নীতি দমন কমিশনের উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা।

---

৯ যেমন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করার আট মাস পর অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। দেখুন : *প্রথম আলো*, ৬ মে ২০০৮।

১০ দেখুন: বক্স ১.১ : ৩১৫ মিনিট ২৯৮ মামলা, পৃ. ২১।

দণ্ড থেকে অব্যাহতি

সরকারি চাকরিজীবীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন, আইনের এরূপ বিধান থাকার ফলে আইন-বহির্ভূত গ্রেফতার বা আটকের দায়ে অভিযুক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না। পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ যে কোনো সরকারি চাকরিজীবীর দ্বারা অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের সময় সংঘটিত কোনো অপরাধের বিচার করতে হলে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৩২ ও ১৯৭ ধারার অধীনে আদালতকে সরকারের পূর্বানুমোদন নিতে হয়। কিন্তু অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের অতিমাত্রায় উদাসীনতার ফলে সরকারি চাকরিজীবীদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না।

জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ এবং জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বাড়তি অব্যাহতি প্রদান করেছে। এসব আইনের অধীনে দায়িত্ব পালনকালে কোনো কাজ সম্পর্কে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশের ৫(১) ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'এই অধ্যাদেশের অধীনে কোনো আদেশ প্রদান করা হলে অথবা এই অধ্যাদেশের অধীনে সৃষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো আদেশ প্রদান করা হলে উক্ত আদেশ সম্পর্কে কোনো আদালতে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।' প্রচলিত অন্যান্য ফৌজদারি আইনের তুলনায় জরুরি বিধিমালার ২(৩) বিধিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞাকে প্রসারিত করে এতে বাংলাদেশ পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), আনসার, ব্যাটালিয়ন আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর), কোস্টগার্ড, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্স ইনটেলিজেন্স এবং আর্মড ফোর্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত রায়

সর্বোচ্চ আদালতে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত অনেকগুলো রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে নারীদের নিরাপত্তা হেফাজত, দ্রুত বিচার, নামের মিল থাকায় ভুল ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক এবং জরুরি বিধিমালা সম্পর্কিত বিভিন্ন রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো–

সুমনা আফরোজা সুমি বনাম রাষ্ট্র মামলায় হাইকোর্ট আবার ঘোষণা করেছেন– নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩-এর ২০ ধারা অনুযায়ী

১৮ বছরের বেশি বয়স্ক কোনো নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা যাবে না।[১১] নিরাপত্তা হেফাজতের যে বিধান আছে তার অপব্যবহার রোধে এই রায় একটি সম্ভাবনাময় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে।

দ্রুত বিচার প্রাপ্তির অধিকার হলো অভিযুক্তকে রক্ষা করার একটি সাংবিধানিক অঙ্গীকার। বিচারাধীন বন্দিদের অধিকার সুরক্ষায় সাংবিধানিক এই বিধানকে কদাচিৎ গুরুত্ব দেয়া হয়। *আবুল কালাম বনাম রাষ্ট্র* মামলায় হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দেন যে, জামিন অযোগ্য কোনো অপরাধের বিচারের জন্য যদি অযৌক্তিকভাবে পাঁচ বছর সময় নেয়া হয়, তাহলে আদালত অভিযুক্তকে জামিন দিতে পারবে।[১২] এ মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২০০২ সালের আগস্টে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার এবং অস্ত্র আইনে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। অভিযোগের সপক্ষে সাক্ষী সংগ্রহ করতে না পারায় বিচারকার্য শেষ হতে বিলম্ব হয় এবং ২০০৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত সে কারাগারে বন্দি থাকে। অনুরূপভাবে *ফরিদ হোসেন বনাম রাষ্ট্র* মামলায় হাইকোর্ট ঘোষণা করেন, আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে জামিন অযোগ্য মামলায়ও জামিন দেয়া উচিত।[১৩] এ মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচার শুরুর পূর্বেই তিন বছর কারাগারে বন্দি রাখা হয়।

মোঃ রাসেল উদ্দিন বনাম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়[১৪] মামলায় নামের মিল থাকার কারণে এক ব্যক্তিকে ২০ মাসের বেশি সময় ধরে কারাগারে আটক রাখা হয়। মোঃ আলম সৌদি আরব ফেরত একজন অভিবাসী শ্রমিক। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে তাকে কক্সবাজারের উখিয়া বাজার থেকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ দাবি করে, সে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে পাচারের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত। বস্তুত তার ভাই সাইদ আলম ছিল এ মামলায় অভিযুক্ত এবং প্রকৃত আসামি। ২০০২ সালে তাকে গ্রেফতার করার পর সে

---

১১ ১৬ বিএলটি (এইচ সি ডি) (২০০৮) ২৯১, রায়ের তারিখ ২৮ এপ্রিল ২০০৮।

১২ ৬০ ডিএলআর (২০০৮) ২৫৪, রায়ের তারিখ ৫ আগস্ট ২০০৭ (রায় প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে)।

১৩ ২৮ ডিএলআর (এইচসিডি) (২০০৮) ২০৯, ১৩ এমএলআর (এইচসিডি) (২০০৮) ১৫২, রায়ের তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭ (রায় প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে)। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৩৯(৪) ধারার বিধান হলো যখন বিচার অযৌক্তিকভাবে বিলম্ব হয় এবং নির্দেশিত সময়ের মধ্যে বিচার শেষ হয় না, তখন জামিন অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন দেয়া উচিত।

১৪ অপ্রকাশিত, রায়ের তারিখ ৩ ডিসেম্বর ২০০৮।

জামিনে মুক্তি পেয়ে আত্মগোপন করে, এই অবস্থায় ২০০৫ সালে তার অনুপস্থিতিতেই বিচার শেষ হয় এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। গ্রেফতারের পর সে নিজেকে মোঃ আলম বলে দাবি করেছিল। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে মোঃ আলমকে গ্রেফতারের পর তাকে সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে আদালতে উপস্থিত করা হয়। আদলতে তাকে নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করার কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি। নামের ভুল সংক্রান্ত তথ্য পুলিশ এবং জেল কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হলেও তারা আসামির সঠিক পরিচয় নির্ধারণে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। যার ফলে প্রকৃত অপরাধীর অপরাধের শাস্তি একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ভোগ করতে বাধ্য করা হয় এবং ২০ মাসেরও অধিক সময় ধরে তার ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার হরণ করা হয়। হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন যে, মোঃ আলমকে জামিনে মুক্তি দেয়া হোক এবং সেই সাথে পুলিশের মহাপরিদর্শককে সঠিকভাবে তদন্ত করার ব্যর্থতার কারণে সংশ্লিষ্ট সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু সেই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অন্য একটি রিট (*হেবিয়াস কর্পাস*) মামলায়, আইন ও সালিশ কেন্দ্র হাইকোর্টে একটি আবেদন দাখিল করে জানায় যে, র‍্যাব কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পর মোঃ হাসান খান নামের এক ব্যক্তির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ২৬ অক্টোবর হাইকোর্ট সরকারের ওপর রুলনিশি জারি করে তাকে সশরীরে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন।[১৫]

জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ এবং জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার সাংবিধানিক বৈধতা প্রসঙ্গে ২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট বেশ কিছু রায় প্রদান করেছেন। ২০০০ সালে সংঘটিত দণ্ডবিধির ৩৮৫ ও ১০৯ ধারার অধীনে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনীত একটি অভিযোগকে জরুরি বিধিমালার ১৯(২) বিধি অনুসারে জরুরি বিধিমালায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমোদন দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। *শেখ হাসিনা বনাম বাংলাদেশ সরকার*[১৬] মামলায় হাইকোর্ট এরূপ অনুমোদনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। হাইকোর্ট রায় দেন, জরুরি অবস্থার সময় যদি এমন কোনো আইন অথবা বিধি প্রণয়ন করা হয় যেটা সংবিধানের ২৭ থেকে ৩৫ অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহলে তা 'শুরু থেকেই বাতিল'

---

১৫ *আইন ও সালিশ কেন্দ্র বনাম বাংলাদেশ সরকার*, অপ্রকাশিত।

১৬ ১৬ বিএলটি (হাইকোর্ট বিভাগ) (২০০৮) ১৫৩; ১৩ বিএলসি (২০০৮) ১২১; ২৮ বিএলডি (হাইকোর্ট বিভাগ) (২০০৮) ১৬১, রায়ের তারিখ ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

[*ভয়েড অব ইনিশিও*] বলে গণ্য হবে এবং কোনো আদালতের দ্বারা কোনো বিচারিক কার্যধারাতেই তা প্রয়োগ করা যাবে না। আদালত আরো মন্তব্য করেন, সংবিধানের ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৫ অনুচ্ছেদের বিধানমতে জরুরি অবস্থার সময় প্রণীত কোনো আইন বা বিধি দ্বারা ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে প্রদত্ত আদালতের কোনো ক্ষমতাকে কাটছাঁট করা যাবে না। সুতরাং জরুরি ক্ষমতা আইনের যে অংশকে ভূতপূর্ব কার্যকারিতা দেয়া হয়েছে, তা অবৈধ এবং ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ জারির পূর্বে সংঘটিত কোনো অপরাধের বিচার এই আইনে করা যাবে না।[১৭] যা হোক, আপিল বিভাগ পরে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার ভূতপূর্ব কার্যকারিতা সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দেন। আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুসারে, সংবিধানের ৩৫(১) অনুচ্ছেদে আইনের ভূতপূর্ব প্রয়োগের ওপর যে নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা শুধু দণ্ড বা শাস্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এটা শুধু *এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো* (অপরাধ সংঘটনের পরে প্রণীত আইন) আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সংবিধানের এই বিধান বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, সুতরাং জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা বৈধভাবে প্রয়োগযোগ্য।[১৮]

জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার অধীনে আটক বা গ্রেফতারকৃত অনেককেই হাইকোর্ট জামিন প্রদান করেন। *মোঃ বখতিয়ার আলম বাপ্পী বনাম রাষ্ট্র*[১৯] মামলায় হাইকোর্ট রায় দেন, জরুরি বিধিমালার ১৬(২) বিধির অধীনে যৌথ বাহিনীকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তা ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকাল আটক বা গ্রেফতার রাখা যাবে না। *ইয়াসির আরাফাত বনাম বাংলাদেশ সরকার*[২০] মামলায় আটককৃত ব্যক্তিকে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার ১৬(২) বিধি অনুসারে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়া এবং আটকের পদ্ধতি সম্পর্কে ফৌজদারি কার্যবিধির ৬১ ও ১৬৭ ধারার বিধান অনুসরণ না করে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে আটক করা হয়। হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, এই আটক আইনানুগ কর্তৃত্ব-বহির্ভূত। এই মামলায় হাইকোর্ট মত প্রকাশ করেন

---

১৭ *প্রাগুক্ত।*

১৮ বাংলাদেশ সরকার বনাম শেখ হাসিনা ও অন্য, ২৮ বিএলডি (আপিল বিভাগ) (২০০৮) ২৮, রায়ের তারিখ ২৯ এপ্রিল ২০০৮।

১৯ ১৬ বিএলটি (হাইকোর্ট বিভাগ) (২০০৮) ৫৪, রায়ের তারিখ ১৪ নভেম্বর ২০০৭ (প্রকাশিত ২০০৮ সালে)।

২০ ১৩ বিএলটি (হাইকোর্ট বিভাগ) (২০০৮) ১৮৩, রায়ের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০০৮।

যে, বিধি ১৬(২) নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শুধু গ্রেফতারের ক্ষমতা প্রদান করেছে, আটক রাখার ক্ষমতা নয়।

জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার অধীনে মামলার জামিনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা অর্পণ করা হলেও ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১ক ধারার অধীনে প্রদত্ত বিশেষ ও অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে হাইকোর্ট ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এরূপ মামলার কার্যধারা স্থগিত করাসহ অভিযুক্তদের জামিন প্রদান করেছেন। *একেএম রেজাউল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র*[২১] মামলায় রায়ে বলা হয়, যেখানে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার দ্বারা নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন হয়নি, সেখানে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে না এবং এক্ষেত্রে বিধি ১৯ঘ অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনের জন্য কোনো বাধা হবে না। রায়ে বলা হয়, যেখানে আইনে অন্য কোনো প্রতিকার নেই, সেখানে আদালত অন্তর্নিহিত ক্ষমতার সাহায্য নিতে পারে। হাইকোর্ট ব্যাখ্যা করেন যে, জরুরি বিধিমালা জামিনের আবেদন করার অধিকার কেড়ে নিয়েছে একথা সত্য কিন্তু এটা দ্রুততম ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত ও বিচার শেষ করার বিধান করেছে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর জামিনের আবেদন করা যাবে, জরুরি অধ্যাদেশ পরোক্ষভাবে এরূপ বিধানই করেছে। বিশেষ করে বিধি ১৫গ সম্পর্কে যে অস্পষ্টতা আছে হাইকোর্ট সেদিকে আলোকপাত করে মত দেন যে, জরুরি বিধিতে দায়েরকৃত কোনো মামলার তদন্ত শেষ করার জন্য সর্বোচ্চ ৬০ দিন সময় নেয়া যাবে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যদি তদন্ত শেষ না হয় তাহলে কারাবন্দি ব্যক্তির কী হবে তা বিধিতে বলা হয়নি।[২২]

যা হোক, জরুরি বিধিমালার অধীনে দায়েরকৃত মামলায় হাইকোর্টের অনেক জামিন আদেশ আপিল বিভাগ বাতিল করে দেন। জরুরি বিধিমালার ১৯ঘ বিধির ব্যাখ্যা দানকারী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মামলা হলো *রাষ্ট্র বনাম ময়েজ উদ্দীন শিকদার ও অন্যান্য*[২৩] মামলাটি। এই মামলায় আপিল বিভাগ ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার অধীনে আগাম জামিনের দরখাস্তের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলে। আপিল বিভাগের মতে, কিছু কিছু বিশেষ প্রকৃতির মামলার ক্ষেত্রে আগাম জামিন প্রদান করা যেতে পারে।

---

২১ ১৩ বিএলটি (হাইকোর্ট বিভাগ) (২০০৮) ১১১, রায়ের তারিখ ৩ ডিসেম্বর ২০০৭ (২০০৮ সালে প্রকাশিত)।

২২ প্রাগুক্ত।

২৩ ১৩ এমএলআর (আপিল বিভাগ) (২০০৮) ২০০৮।

কিন্তু বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের সিডিউলে বর্ণিত অপরাধে অভিযুক্ত [এই অপরাধ অবশ্য জরুরি ক্ষমতা বি-ধিমালার ১৯ঘ বিধিতেও অন্তর্ভুক্ত] এবং হাইকোর্টে আত্মসমর্পণ করে আগাম জামিন লাভ করেছে। আপিল বিভাগ রায়ে বলেন, জরুরি বিধিমালার ১৯ঘ বিধির ভাষাকে যদি অনুধাবন করা যায় তাহলে এটা পরিষ্কার হবে যে এই মামলায় ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৮ ধারার অধীনে হাইকোর্টের আগাম জামিন দেয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। আপিল বিভাগের মতে, আগাম জামিন হলো একটি বিশেষ প্রতিকার, তাই আনুষঙ্গিক অবস্থা বিবেচনায় আনা উচিত এবং যদি আনুষঙ্গিক অবস্থায় এটা প্রকাশ পায় যে মামলাটি দুরভিসন্ধিমূলকভাবে বা রাজনৈতিক স্বার্থে করা হয়েছে তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগাম জামিন প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু আলোচ্য মামলায় আগাম জামিন পাওয়ার মতো এরূপ কোনো অবস্থা বিদ্যমান ছিল না। *দুর্নীতি দমন কমিশন বনাম সৈয়দ তানভীর আহম্মেদ*[২৪] মামলায় অ-ভযুক্ত ব্যক্তি জরুরি বিধিতে গ্রেফতার হওয়ার পর হাইকোর্ট থেকে জামিন লাভ করে। আপিল বিভাগ জামিন বাতিলপূর্বক ঘোষণা করে যে, বিধি ১৯ঘ অনুসারে যদি জরুরি বিধিতে মামলা হলে ঐ মামলায় হাইকোর্টের জামিন দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৮

বাংলাদেশে ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত করার দায়িত্ব পুলিশের, এরূপ তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশ কদাচিৎ ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান অনুসরণ করে থাকে। সম্প্রতি শত বছরের পুরনো ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে থানাগুলোতে সেবা কেন্দ্র স্থাপন, পাচারের মতো অপরাধের তদন্তে নতুন তদন্ত বিভাগ স্থাপন, পুলিশদের লিঙ্গ সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে লিঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার কথা এই খসড়া আইনে বলা হয়েছে।[২৫]

ঔপনিবেশিক যুগের পুলিশ আইনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দমনমূলক পুলিশি ব্যবস্থাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু খসড়া অধ্যাদেশে দায়িত্ব

২৪ ১৬ বিএলটি (আপিল বিভাগ) (২০০৮) ২২০, রায়ের তারিখ ২৯ এপ্রিল ২০০৮।

২৫ পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম, বাংলাদেশে পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দেখুন : http://www.prp.org.bd

পালনের সময় মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর কার্যাবলি তদারকির জন্য এখানে একটি স্বতন্ত্র পুলিশ কমিশনের বিধান রাখা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যের অবহেলা, অপব্যবহার বা অপরাধ সম্পর্কে যে কোনো অভিযোগ গ্রহণ, অভিযোগের তদন্তের জন্য আলাদা একটি পুলিশ অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের বিধানও খসড়া অধ্যাদেশে আছে। পুলিশ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনিক ক্ষমতা কার হাতে যাবে এ নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধের ফলে খসড়াটি প্রণয়নে দীর্ঘ বিলম্ব হলেও শেষ পর্যন্ত খসড়া অধ্যাদেশটি ২০০৮ সালের ডিসেম্বর সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।[২৬]

ভিকটিমের ক্ষতিপূরণ

যদিও অবৈধ গ্রেফতার বা আটকের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত এবং বাংলাদেশের আদালতগুলোও এরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে, কিন্তু যেহেতু ২০০৮ সালের মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত মৌলিক অধিকার স্থগিত ছিল এজন্য এই সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনো আদেশ প্রদান করা হয়নি।

অনুবাদ : মিজান মালিক

২৬ খসড়া অধ্যাদেশটি দেখুন : http://mha.gov.bd/pdf/policeord08.pdf; বিস্তারিত দেখুন : *আইন ও পলিসিগত উন্নয়ন* বিষয়ক অধ্যায় ২।